পূরবী বসু

দিনরাত্রির ছায়াঘর

গতকালই প্রথম নয়। বেশ কিছুদিন ধরেই লক্ষ্য করছে সোমা, সারা মুখ জুড়ে কেমন যেন একটা ভাঙচুর ঘটছে তার। হাসলে পরে ঠোঁটের ডাইনে-বাঁয়ে দু'পাশে আধভাঙা চাঁদের মতো রেখা বরাবরই পড়তো তার। এখন যেন তা আরো স্পষ্ট হয়েছে। গলার ওপর থেকে একপ্রস্থ মেদ আর মাংস কেউ যেন চেঁছে নিয়ে গেছে। গলাটা আগের চেয়ে সরু ও লম্বা দেখায় তাই। কাল রাতেই প্রথম চোখে পড়ল, গালের নিচে কানের দুপাশ থেকে চিবুক পর্যন্ত সোজা নেমে আসা কোনাকুনি লম্বা যে হাড়দুটো রয়েছে, তার ঠিক মাঝখানটিতে সামান্য ঝুলে পড়েছে একখণ্ড মাংসপিণ্ড। এ-ভাঙনের মধ্যেও প্রকৃতির কী অদ্ভুত সামঞ্জস্য! চিবুকের দু'ধারে একই জায়গায় একই রকম এই ঝুলে পড়া। সোমার টানটান মুখটাতে এ-শিথিল মাংসপেশি যেন মানায় না। একে মেনে নেওয়া কষ্টকর। প্রথমে সোমার মনে হয়েছিল, যা দেখছে তা ঠিক নয়।

ভেবেছিল, উঁচু সিলিং থেকে বিচ্ছুরিত আলোর প্রতিফলন ঠিকমতো পড়েনি বলেই এমন দেখাচ্ছে। কিন্তু বাথরুমে গিয়ে আয়নার সামনে উজ্জ্বল আলোতে এসে সোমা নিশ্চিত হয়, যা দেখছে তা দৃষ্টিভ্রম নয়। এটাই তার পরিচিত মুখের আসল চেহারা আজ। দু'গালের নিচে দু'পাশে ছোট্ট মাংসপেশি যেখানে ঝুলে আছে, তার ঠিক ওপরে দুইদিকেই মৃদু গর্তের মতো আবছা কালচে একটা আভাস। অর্থাৎ মাংসখণ্ডটি সেখান থেকেই সরে এসেছে নিচে – নিজের জায়গা ছেড়ে। ডিম্পল বলে একে চালিয়ে দেওয়ার যো নেই। ডিম্পল গালের যেখানে টোল ফেলে, সেখান থেকে এর দূরত্ব বেশ খানিকটা।

অবিনাশ ঘরে ছিল না। অন্যান্য অনেক বুধবারের মতো কাল রাতেও ছিল তার অফিসের ডিনার। অবসর গ্রহণ করার পর আবার চুক্তিভিত্তিক কাজে যোগ দেওয়ার পর থেকে অফিসের বাইরে অফিস সংক্রান্ত কর্মকাণ্ডে অনেক বেশি এখন সময় কাটে অবিনাশের। আগের চেয়ে আগ্রহ ও মনোযোগও বেশি সেখানে। এমিলি বলে ইঞ্জিনিয়ার মেয়েটিও নিশ্চয়ই আছে সেখানে, মানে সেই ডিনারে। মাত্র বছরখানেক আগে কাজে যোগ দিয়েছে মেয়েটি। দারুণ কাজপাগল। শুধু লেখাপড়ায় ভালো আর চটপটে স্বভাবেরই নয়, খাটতেও পারে প্রচুর। তার তরুণ স্বামীটিও অত্যন্ত যত্নবান স্ত্রীর ক্যারিয়ারের ব্যাপারে। দীর্ঘসময় অফিসের কাজে ব্যয় করতে তাই অসুবিধা হয় না এমিলির। ছেলেপুলে হলে তো আর পারবে না, তাই এখুনি খেটেখুটে যতোটা সম্ভব ক্যারিয়ারটা গুছিয়ে নিতে চায়। এমিলি নিজেই এসব কথা বলেছে সোমাকে এক দ্বিপ্রাহরিক খাবারের আয়োজনে। ভাগ্যবানরাই ওসব পারে।

ছেলেপুলে, ঘর-সংসার নিয়ে ক্যারিয়ারের কথা ভিন্নভাবে ভাবার সুযোগ তো হয়নি সোমার। এ-প্রসঙ্গে পাশের বাড়ির মেরির কথা মনে পড়ে। পড়াশোনা বেশি করেনি মেরি। চাকরিবাকরিও নয়। কিন্তু জীবন আহরিত প্রজ্ঞা দিয়ে যৌথজীবন সম্পর্কে অনেক সত্যই আবিষ্কার করেছে সে, যা সোমার কাছে সত্যি বিস্ময়।

আয়নায় নিজের চেহারা ভালো করে লক্ষ্য করার পর কাল সারারাত ভালোমতো ঘুম হয়নি সোমার। মাঝে মাঝেই জেগেছে। পড়ার ঘরে বসে বসে অনেক রাত পর্যন্ত কী লিখছিল অবিনাশ। সোমা একবার মাত্র উঁকি দিয়েছিল সেখানে। গৌরব এখনো সিয়াটলেই আছে।

সামনের মাসে শিকাগোর এক আইটি ফার্মে যোগ দেবে। ওকে ফোন করার জন্যে এখনো বেশি রাত হয়নি। সোমা শুয়ে শুয়ে পুত্রের টেলিফোনের নম্বর টেপে। চার-পাঁচবার বাজার পর অ্যান্সারিং মেশিনে চলে যায় কল। বড় পরিচিত, বড় প্রিয় এ-গলার স্বর। কিন্তু এর সঙ্গে তো কথা বলা যায় না! এ যে যন্ত্র! গৌরবের বাসার ফোন নয় এটা, তার সেলুলার নম্বর। সঙ্গেই থাকার কথা। নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছে, আবার সেই মায়ের কল, একই পুরনো বুলি, একই শোনা কথার পুনরাবৃত্তি। নয়তো একই ধরনের সাবধানবাণী। এসব কথা বারবার আর কত শুনবে ওরা? অথচ আজ কিন্তু সোমা অন্যকথা বলতো। বলতো, ওর চাকরি বদলাবার আগেই ওর সঙ্গে এক উইকএন্ডে সিয়াটল, ভ্যানকুভার বেরিয়ে আসার কথা ভাবছে সোমা। গৌরবের জন্যে এটা কি ভালো সময়? এরকম একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব মেশিনে রাখতে ইচ্ছে হলো না সোমার। তাই কোনো কথা না বলেই রেখে দিলো রিসিভার।

দ্বিতীয়বার যখন বাথরুমে গেল, জল খেল, চোখেমুখে প্রচণ্ড গরম লাগা – জ্বালা করা চামড়ায় যখন ঠান্ডা জলের ছিটা দিল, তখনই হঠাৎ সোমা আবিষ্কার করলো, আগের মতো ঘণ্টার পর ঘণ্টা যখন খুশি নিশ্চিন্তে আর ঘুমুতেও পারে না সে আজকাল। রাতে হঠাৎ গরম লেগে যায়। কখনো আবার বেশ ঠান্ডা লাগে, বিশেষ করে হাতের আঙুলে, পায়ের পাতায়। অনেক বেশি স্বপ্ন দেখে আজকাল – বেশিরভাগই দুঃস্বপ্ন। মাস শেষে নির্ধারিত চার-পাঁচটি দিনের শারীরিক অস্বাচ্ছন্দ্য যখন থেকে শেষ হয়ে গেল, প্রায় তখন থেকেই অর্থাৎ এ বছরের গোড়া থেকেই শারীরিক অস্বস্তি আর টুকটাক ব্যথা-বেদনা নিত্যদিনের সঙ্গী হয়ে উঠেছে তার। কারণে-অকারণে দুশ্চিন্তা করার প্রবণতাও বেড়েছে অনেকখানি।

ঠান্ডা জলের ছিটা চোখেমুখে পড়ায় এখন অনেকটা ভালো লাগছে তার। রাত প্রায় দুটো বাজে। তিসাকে ফোন করার জন্যে এমন কিছু বেশি দেরি হয়নি। এখান থেকে দুঘণ্টা পিছিয়ে আছে ওর সময়। তাছাড়া বাবার মতোই ছেলেমেয়ে দু'জনেই রাতজাগা মানুষ। ওরা ঘুমোতে যায় ভোররাতে। তবু ভয়ে ভয়েই টেলিফোন নম্বরগুলো টেপে মেয়ের।
ভয়, কেননা মাত্র পরশুই কথা বলেছে। এতো তাড়াতাড়ি আবার ফোন করলে মেয়ে সাধারণত বিরক্ত হয়। ঘরেই ছিল তিসা। এ-কথা সে-কথার পর সোমা জানতে চায়, মেমোরিয়াল ডে উইকএন্ডে কোনো কিছু করার পরিকল্পনা আছে কিনা তার। তা নইলে মা-মেয়ে একসঙ্গে কিছু করার কথা ভাবা যেতে পারে। অনেকদিন কোথাও যায় না সোমা। মেয়ের কাছে যেতে পারে তখন। অথবা তিসা আসতে পারে এখানে। কিন্তু মায়ের প্রস্তাব শোনার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তিসা জানায়, এই উইকএন্ডে নিউইয়র্ক থেকে তার বন্ধু সোনিয়া আর মারিয়া আসছে তার কাছে। ওরা ঠিক করেছে, সবাই মিলে পাশের স্টেটে ওয়াইনারি দেখতে যাবে। তিসা অবশ্যই কিছু করতে চায় মায়ের সঙ্গে। কিন্তু সেটা হতে হবে লেবার ডে অথবা থ্যাংকস গিভিং উইকএন্ডে। সোমা বোঝে, দেড় মাস সময় যথেষ্ট নয় ওদের সঙ্গে কোনো কিছু করার পরিকল্পনা মেলাবার জন্যে। তাছাড়া এ-বয়সে মা-বাবার চাইতে বন্ধুদের সঙ্গে সময় কাটাতেই বেশি আগ্রহী থাকবে তারা, এটাই তো স্বাভাবিক। শুয়ে শুয়ে এপাশ-ওপাশ করে সোমা। আরো অনেকক্ষণ ঘুম আসে না। একবার মনে হয়, অতুলপ্রসাদের বা রজনীকান্তের গান ছেড়ে দেয় নিচু শব্দে। পরে ভাবে, থাক। আজকাল কী যেন হয়েছে।
ঘন ঘন আর গান শোনে না বলেই কিনা কে জানে? প্রিয় কোনো গান শুনলে, তার একটি কী দুটি কলি সারাক্ষণ কানে বাজতে থাকে একটানা। কিছুতেই থামে না। সোমা আবারও জল খায়। অন্ধকার ঘরে চুপচাপ চোখ বুঁজে শুয়ে থাকে ঘুমের প্রত্যাশায়। এমন একটা সময় ছিল, যখন অবিনাশ শুতে না-এলে ঘুমুতে পারতো না সোমা। অবিনাশকে জড়িয়ে ধরে তার গলার কাছে মাথা গুঁজে না-দিলে ঘুম আসতো না। এ-পুরনো অভ্যেস কাটিয়ে উঠতে অনেকদিন লেগেছে। এখনো পুরোপুরি রেশ যায়নি তার। কোনো কোনো রাতে ক্রমাগত এপাশ-ওপাশ করতে করতে একসময় ঘুমিয়ে পড়ে। অবিনাশ প্রতিরাতে একা একা বসে টেলিভিশনে পুরনো দিনের ছবি দেখে। দেখতে দেখতে কখনো কখনো হাসে, অস্পষ্ট মন্তব্য করে বা কেবল আবিষ্ট হয়ে চুপচাপ কথা শোনে পাত্রপাত্রীর। এসময়টা তার একান্তই নিজের। অবিনাশ তখন অন্য আরেক জগতের বাসিন্দা যেখানে তার নিজস্ব অস্তিত্ব ছাড়া থাকে শুধু টিভির পর্দার চরিত্রগুলো।

ঘুম থেকে উঠতে একটু দেরি হয়ে যায় আজ। অ্যালার্ম বেজেছে কী বাজেনি খেয়াল করতে পারে না সোমা। এরই মধ্যে কখন ঘুম থেকে উঠে অফিসে চলে গেছে অবিনাশ। রাতে কখন সে ঘুমুতে এসেছিল, কখনই-বা উঠল, কিছুই জানে না সোমা। সাধারণত সাড়ে নটা দশটার আগে কাজে যায় না অবিনাশ। কিন্তু আজ ব্যাংক থেকে কারা যেন আসবে। জরুরি মিটিং আছে তাদের সঙ্গে। কালরাতেই তাই ডিম সেদ্ধ করে, সিরিয়েলের বাটি ও একটি কলা টেবিলের ওপর রেখে দিয়েছিল সোমা। শোবার ঘরের জানালার ব্লাইন্ডগুলো খুলে দেয় সোমা। পুবের দিকে মুখ করা এই ঘর। এক ঝাঁক রোদ্দুর এসে ঝিকমিক করতে থাকে ঘরের মেঝেতে পাতা ভারি কার্পেটের ওপর। এই সাত সকালেই কয়েকটা বাচ্চা ছেলেমেয়ে খেলা করছে সামনের গোলচত্বরে। সোমা নিচের তলায় রান্নাঘরে গিয়ে চায়ের জল চাপায়। এমনিতে সকালবেলা কিছু মুখে না দিয়েই সে চলে যায় অফিসে। চা-কফি পর্যন্ত নয়। আজ হঠাৎ ইচ্ছা হলো অফিসে দেরি করে যাওয়ার। তাই নিজের জন্যে আজ ব্রেকফাস্ট বানাবার কথা ভাবছে সোমা। দাঁত মাজতে মাজতে বাথরুমের আয়নায় মুখের সেই অসঙ্গতি আবার খুঁটিয়ে দেখার চেষ্টা করে। পরিবর্তনগুলো আজ সকালে তেমন প্রগাঢ় মনে হয় না আর। আশ্চর্য, এরই মধ্যে সব মেনে নিল সোমা? কানের দুপাশে জুলফিতে একটা দুটো রুপোলি চুল চিকচিক করছে। সোমা বোঝে বার্ধক্যের জয় বোধহয় এখানেই যে, তা হঠাৎ করে একদিন এসে ভর করে না শরীরে। আস্তে আস্তে একটু একটু করে তার লক্ষণগুলো প্রকাশিত হয় শরীরে, যাতে মানুষও ধীরে ধীরে তা সয়ে নিতে পারে। মেনে নিতেও কষ্ট হয় না তেমন।
সোমা ঠিক করে আজ বেশ দেরিতে কাজে যাবে। ফলে নিজের জন্যে ভালো করে ব্রেকফাস্ট বানায় সে। কাঁচামরিচ, পেঁয়াজ দিয়ে বানানো অমলেট আর টোস্ট করা ইংলিশ মাফিনের সঙ্গে কড়া করে চা খায় সোমা। খেতে খেতে বাইরের দিকে তাকায়।
কালচে-কমলা রংয়ের ছোট ছোট দুটি রবিন পাখি কিচিরমিচির করছে ডেকের ওপর। অনেকদিন রবিন পাখি দেখে না সোমা। এ পাখিগুলো এতো কাছে তো কখনো আসে না! নাকি আসে এই সাতসকালে যখন তাড়াহুড়োয় বাইরের দিকে তাকাবার সুযোগ হয় না সোমার! রান্নাঘরের পেছনের দরজাটা অতি সন্তর্পণে খুলে মুখটা একটুখানি বার করতেই ফুরুৎ করে রবিন দুটো উড়ে গিয়ে পেছনের জঙ্গলের মধ্যে হারিয়ে যায়। সোমা ততক্ষণে ঠিক করে ফেলেছে আজ আর কাজে যাবে না। অনেকগুলো ছুটির দিন জমা হয়ে আছে।
অবিনাশের যা ব্যস্ততা, এই গরমে কোথাও দূরে বেড়াতে যাওয়া হবে, মনে হচ্ছে না। আজ অফিসে যাওয়ার একটাই বড় তাড়া ছিল, আর তা হলো আজ ক্যারলের জন্মদিন। অফিসের মধ্যে এই একটি মেয়ের সঙ্গেই প্রকৃত অর্থে হৃদ্যতা রয়েছে

সোমার। ওরা পরস্পরের জন্মদিন মনে রাখে। গত ডিসেম্বরে দেশ থেকে আসার সময় আড়ং থেকে ক্যারলের জন্যে রুপোর হার, কানের দুল ও ব্রেসলেট নিয়ে এসেছিল সোমা জন্মদিনে দেবে বলে। ছুটি নেওয়ার সিদ্ধান্তটা অফিসে ফোন করে জানাবার সঙ্গে সঙ্গে ক্যারলকেও হ্যাপি বার্থডে জানাতে ভুললো না সোমা। সেই সঙ্গে ঠিক করল, দুজনে মিলে অলিভ গার্ডেনে লাঞ্চ খাবে আজ। ইতালিয়ান খাবার ক্যারলের বড়ই পছন্দ। ওর জন্মদিনে ওর পছন্দের খাবারই খাওয়াবে সোমা। ক্যারল যেন অফিস থেকে ঠিক পৌনে বারোটায় অলিভ গার্ডেনে চলে আসে। অফিসে আজ যাবে না এ-সিদ্ধান্তটা নেওয়ার পর হঠাৎ করেই কেমন যেন হালকা ফুরফুরে লাগতে থাকে তার। একবার মনে হলো অবিনাশকে ফোন করে জানায় সিদ্ধান্তটার কথা। পরক্ষণেই মনে হলো, দরকার নেই। শুধু শুধু এক গাদা প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। শরীর খারাপ যে নয়, তাও বোঝাতে হবে।

চায়ের কাপটা হাতে নিয়ে বাইরে বেরোয় সোমা। ডেকে পেতে রাখা চেয়ারে বসে সামনের গোলাকার কাচের টেবিলটির ওপরে রাখা অ্যাসপ্যারাগাস গাছটির দিকে তাকায়। প্রায় মরেই গিয়েছিল গাছটা। রোদ আর বৃষ্টির সঙ্গে উত্তাপ মিলে এ-কদিনেই গাছটা বেশ চাঙ্গা হয়ে উঠেছে। এই তো গত মাসেই ঘর থেকে বের করে এখানে এনে রেখেছিল গাছটা। সোমা কাঠির মতো একটা শুকনো ভাঙা ডাল যত্নের সঙ্গে ছোট্ট গাছটির গা থেকে সরিয়ে দেয়। চা খেতে খেতে চারদিকে তাকায় সোমা। পাশের বাড়ির কুকুরটা সোমাকে দেখে একবার ঘেউ ঘেউ করে ওঠে।

কাচের বড় জানালা দিয়ে ওদের পেছনের এই ঘরের ভেতরটা প্রায় সবটাই দেখা যায়। কুকুরটা বেশ বড়সড় হয়ে গেছে। এই তো গতবছরই এতটুকুন ঘরে এনেছিল। ওদের বিশাল টিয়া পাখিটা আজো একই লয়ে কী যেন বলে চলেছে। কিছুই বুঝতে পারছে না সোমা। পাখিটিকে আর্জেন্টিনা থেকে নিয়ে এসেছে ওরা। এ-বাড়ির কর্ত্রী সেখানকারই মানুষ। তার জন্মদিনে নাকি মায়ের উপহার ছিল সেটি। কতদিন হয়ে গেল পাশের বাড়ির ওদের সঙ্গে দেখা পর্যন্ত হয়নি, কথা বলা তো দূরের কথা। ভোরবেলা ঊর্ধ্বশ্বাসে অফিসে যায়, সন্ধ্যায় ঘরে ফেরে। সপ্তাহান্তে হয় ঘরের কাজ, নয়তো শহরে যাওয়া বা কোথাও নেমন্তন্ন খাওয়া, এই তো জীবন। সোমা আজ মনোযোগ দিয়ে শোনার চেষ্টা করে পাখিটি কী বলছে। আর আশ্চর্য! একটু কান পাততেই সে স্পষ্ট শুনতে পায় টিয়াপাখিটি বারবার করে বলছে, হাউ আর ইউ? সোমা হাসে। ওদিকে ডেকের রেলিংয়ের কাছে দাঁড়িয়ে পাখিটির দিকে মুখ বাড়িয়ে ঝুঁকে হেসে বলে, 'আই অ্যাম ফাইন, হাউ ডু ইউ ডু?' টিয়া চুপ করে যায়। সোমা ডেক ছেড়ে সিঁড়ি বেয়ে ঘাসের ওপর নেমে আসে। হাঁটতে হাঁটতে সীমানা ঘেঁষে লাগানো স্টিলের বেড়ার কাছে চলে আসে। এই কয়েক সপ্তাহ আগেও ওদের বাগানের সীমানার ওপারের গাছগুলোতে একটিও পাতা ছিল না। লম্বা, কালো অথবা সাদা সাদা বিশাল কাণ্ড পাটখড়ির মতো ঠাঁয় দাঁড়িয়ে থাকত। পাতা না থাকায় ওপাশের বাড়িঘরগুলো স্পষ্ট দেখা যেত। কিন্তু এরই মধ্যে কলাপাতা রঙের হালকা সবুজপাতায় ঘন হয়ে এসেছে বন। বার্চ আর ম্যাপলের গাছগুলোর পাতা হাওয়ায় মৃদু শব্দ করছে। বেশ সতেজ ও সুস্থ দেখাচ্ছে গাছগুলোকে এখন। যেন হঠাৎ করেই সব গাছের শরীরে পাতা এসে জড়ো হয়েছে। গাছের ফাঁক দিয়ে বনের ঠিক মাঝখান দিয়ে বয়ে যাওয়া ছোট্ট জলধারাটির দিকে তাকায় সোমা। সরু হলে হবে কি, কুলকুল শব্দ করে পাথরের কুচির মধ্য দিয়ে নিরন্তর বয়ে চলেছে ঝর্ণাটি। গত কয়েকদিন একটানা বৃষ্টি হবার জন্যেই বুঝি জলধারাটি অনেক প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে এখন। দুটো সাদা কাণ্ডের বিশাল লম্বা বার্চ গাছের মাঝখান দিয়ে নালাটির উলটোধারে পড়ে থাকা বিশাল বিশাল পাথর খণ্ডগুলোর দিকে চোখ পড়ে সোমার। বিকেলের দিকে এই নির্জন জায়গাটিতে মাঝে মাঝে দু-চারটি অল্পবয়সী ছেলেমেয়েকে আসতে দেখা যায়। প্রেম করার জায়গা হিসেবে, বিশেষ করে পয়সাকড়িহীন কিশোর-কিশোরীদের প্রেম নিবেদনের জন্যে জায়গাটি উত্তম সন্দেহ নেই।

এখন এই সাতসকালে অবশ্য ওদিকে কেউ নেই। এলে আসবে ওরা বিকেলের দিকে, পড়ন্ত রোদে – তাও কেবল এই বসন্ত আর গ্রীষ্মের কটা মাসেই। সোমা হঠাৎ লক্ষ্য করে পাথরগুলোর গায়ে কী যেন লেখা লাল, নীল, সাদা রং দিয়ে। চেষ্টা করেও পড়তে পারে না সোমা। এর আগে এখান দিয়ে কতবার হেঁটেছে। কখনো চোখে পড়েনি এই রং বা লেখা। ভালোমতো ওদিকে কখনো তাকিয়েছে কিনা সন্দেহ। হঠাৎ সোমার খুব আগ্রহ হয়, কী লেখা আছে পাথরগুলোতে জানার জন্যে।

সোমা দ্রুত ঘরে ফেরে। কফি-টেবিল থেকে চশমাটি তুলে চোখে পরে আবার বেরিয়ে আসে। এ-অঞ্চলের গাছগাছালির মধ্যে পাইন, স্প্রুস, উইলো অথবা ওক তেমন দেখা যায় না যেমনটি সে দেখতে পেত দক্ষিণে। তা সত্ত্বেও কী দারুণ সবুজ চারদিক! সোমা চশমা চোখে দিয়ে আবার সেই আগের জায়গাটিতে এসে দাঁড়ায় যেখান থেকে ওই ছোট্ট জলধারা আর বিশাল বিশাল পাথরগুলো দেখা যায় গাছের ফাঁক দিয়ে। হ্যাঁ, এবার স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে সোমা। পাথরের গায়ে বড় করে নীল রঙে লেখা আছে – লিসা। তার নিচে লাল রঙের বিশাল এক হৃদয়। তারও নিচে সাদা রঙে লেখা রন। অর্থাৎ লিসা রনকে ভালোবাসে। সোমা হাসে। বড় সুন্দর নারী পুরুষের – বিশেষ করে উঠতি-বয়সী ছেলেমেয়েদের পরস্পরের প্রতি এই আকর্ষণ ও অভিব্যক্তি। লনের ঘাসগুলো এরই মধ্যে বেশ বড় হয়ে গেছে। মাত্র এক সপ্তাহ আগেই ঘাস কাটা হয়েছে। এরই মধ্যে কেমন করে এতো বড় হয়ে গেল এগুলো! সোমা লক্ষ করে বাঁ-পাশের বাড়ির মেরি ডাকছে সোমাকে।

বহুদিন পক্ষাঘাতে শয্যাশায়ী থেকে গতবছরেই মারা গেছে মেরির চল্লিশ বছরের বিবাহিত জীবনের স্বামী পল। এখন এতো বড় বাড়িটিতে সে একাই থাকে। ছেলেমেয়েরা যে-যার জায়গায়।

এই সাতসকালেই ইস্ত্রি করা স্কার্ট আর ব্লাউজ পরে একেবারে ফিটফাট মেরি। টমেটো গাছে জল দিচ্ছিল সে। সোমা কাছে দিয়ে দাঁড়ায়। গাছের গোড়ায় মাটি নেড়ে দিতে দিতে সোমার সঙ্গে গল্প করে মেরি। এই মহিলা পড়াশোনা বেশি করেনি। চাকরি-বাকরিও করেনি জীবনে। কিন্তু ওর সঙ্গে কথা বললে বোঝা যায় না যে সে হাইস্কুলও পাশ করেনি। প্রাতিষ্ঠানিক পড়াশোনা না করলেও সাধারণ বুদ্ধি ও জাগতিক প্রজ্ঞা অসাধারণ মেরির। স্থানীয় লাইব্রেরিতে নিয়মিত যায়, বই পড়ে, দেশের-জগতের হালচালের খবর রাখে। মেরির সঙ্গে অনেকদিন পর আজ দেখা হলো সোমার। শীতের সময় দেখা হয়েছিল, যখন তারা দুজনেই গাড়ি পরিষ্কার করছিল এক বরফের দিনে। মেরির কথা শুনতে খুব ভালো লাগে সোমার। একদিন এমনি করে মেপল গাছের নিচে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ কথা বলেছিল তারা গত সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে। স্বামীর মৃত্যু শোক তখনো থিতিয়ে আসেনি। এরই মধ্যে যে গভীর উপলব্ধি আচ্ছন্ন করেছিল মেরিকে, তা সোমার কাছে প্রকাশ করতে দ্বিধা করেনি মেরি। বলেছিল, দীর্ঘ বিবাহিত জীবনযাপনের পর একজন চলে গেলে আরেকজনের যে-কষ্ট আর একাকিত্ব দেখা দেয়, তার মূল কারণ দুটো। এক, একটা চলমান জীবনে – অতি অভ্যস্ত ও প্রাত্যহিক জীবনযাত্রায় হঠাৎ একটা ছেদ পড়ে যায়। এই 'ডিজরাপশন অফ কন্টিনিউটি' মেনে নেওয়া কষ্টকর। দুই, কিছু আক্ষেপ নাকি থেকেই যায়। যা করার ছিল, করা যেত, অপর পক্ষ চেয়েছিল বা শখ করেছিল কিন্তু যে-সাধ অপূর্ণ রয়েছে, সেইসব আক্ষেপ, কিছু কিছু, সবসময়েই তাড়া করে বেড়ায়। সোমার অনেকবার মনে হয়েছে, মেরি এদেশে জন্মেছে, এদেশে বেড়ে উঠেছে ঠিকই, কিন্তু ওর চিন্তায়-চেতনায় কোথায় যেন একটা পূর্বাঞ্চলীয় গন্ধ রয়েছে। এদেশের সাধারণ মানুষের মধ্যে এতোটা পিছুটান দেখেনি সোমা। ওর স্বামী যখন পক্ষাঘাতে বিছানায় পড়া ছিল, একটি অল্পবয়সী নার্স এসে প্রতিদিন তার দেখাশোনা করে যেত। সেই নার্সই পলকে বিছানায় বসিয়েই চান করাত, গা মুছে দিত, পোশাক পালটে দিত। ফিজিওথেরাপি করাত। কিন্তু মেরি প্রতিদিন নিজের হাতে স্বামীকে খাওয়াত তিনবেলা, মাঝেমাঝেই চুল আঁচড়ে দিত। পাশে বসে বই পড়ে শোনাত। দুজনে মিলে পুরনো দিনের গান শুনত টেপে-রেডিওতে। এই গভীর আত্মনিবেদন, এমন পারস্পরিক মানসিক নির্ভরশীলতা দেখে মুগ্ধ হতো সোমা। কিন্তু এই মেরিই একদিন বলেছিল, মেয়েদের কাছে পুরুষরা দুটো জিনিসই প্রধানত চায়। এক, তার সৌন্দর্য ও যৌবন। দুই, নিঃশর্তভাবে আত্মসমর্পণ। মেরি বলেছিল, নারী-পুরুষের সম্পর্কের সবচেয়ে বড় ট্র্যাজেডি হলো, পুরুষ কখনো তার পার্টনারের সঙ্গে বৃদ্ধ হতে চায় না। বৃদ্ধ স্ত্রীকে পাশে রেখেও সে আজীবন তরুণ থাকতে চায়। পলকে দেখিয়ে তামাশা করে কতবার বলেছে মেরি, শরীর নাড়াতে পারে না, তাতে কী হলো? চোখের দৃষ্টি দিয়ে এখনো গিলে ফেলতে চায় তরুণী নার্সটিকে।

পল হেসে মেরির হাতটি সস্নেহে চেপে ধরত তখন। সোমার মনে হতো পলের মৃত্যুর পর মেরি বেশিদিন বাঁচবে না, অথবা আর কখনো স্বাভাবিক হয়ে উঠবে না। প্রথমে সে আসলেই খুব মুষড়ে পড়েছিল। কারো সঙ্গে দেখা করত না – কথা বলতো না। ঘরের বাইরে বেরুত না। একদিন কেবল সোমাকে বলেছিল, দীর্ঘ বিবাহিত জীবনের সবটাই যে মধুমাখা ছিল তা নয়। অনেক তর্ক-বিতর্ক, ঝগড়া, মন কষাকষি হয়েছে। এমনকি ব্যভিচারের ঘটনাও ঘটেছে। তবু, একটা মানুষ ছিল এ-ঘরে সারাক্ষণ, এখন আর সে নেই, মাথা কুটলেও তাকে আর কখনো দেখা যাবে না, পাওয়া যাবে না – এই বোধটি বড় যন্ত্রণাদায়ক। আস্তে আস্তে মেরি আবার ঘরের বাইরে বেরুতে শুরু করেছে। ফুলের, তরি-তরকারির বাগান করে বসন্তে-গ্রীষ্মে। শীতে অল্প বরফ হলে নিজেই পরিষ্কার করে। বেশি হলে লোক ডাকে। হেমন্তে শুকনো পাতা গুছিয়ে ব্যাগে ভরতেও দেখেছি তাকে। এ বয়সে এতো কাজ করে বলেই এমন সুস্থ ও ফিট রয়েছে। শরীরে এক ফোঁটা বাড়তি মেদ নেই মেরির, আজই তা ভালো করে লক্ষ্য করল সোমা। মেরি তার বাগান থেকে একটা বড় সাদা লিলি ফুল তুলে দিল সোমার হাতে। লম্বা সরু ডগার ওপর কলকের মতো সবজে সাদার বিশাল এক লিলি। মেরিকে ধন্যবাদ দিয়ে ডান পাশের লন ভেঙে নিজের বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ায় সোমা। সামনের ফুলের বাগানটিতে লাল, হলুদ কত টিউলিপ ফুটেছে। এরই ভেতর কয়েকটা টিউলিপের গায়ে আবার একাধিক রং – লাল-হলুদ, অথবা সাদা-লাল। হলুদ অথবা হলুদ-সাদার অসংখ্য ড্যাফোডিলসও রয়েছে। এগুলো সব হঠাৎ করে আজই কী একসঙ্গে ফুটে উঠল? কই! আগে তো লক্ষ করেনি। এ-পথ দিয়েই তো প্রতিদিন ভোরে কাজে যায়, বিকেলের পড়ন্ত বেলায় এ-পথেই ঘরে ফেরে। কলিগুলো দেখেছিল মনে আছে।

কবে সব ফুল হয়ে ফুটে উঠল, টেরই পায়নি সোমা। বেগুনি আর গোলাপি রঙের সহস্র সহস্র কুঁড়ি অ্যাজালিয়ার ঝাড়ে। এখনো ফুটতে তিন-চারদিন বাকি। গোলাপ গাছগুলোর কাছে এসে দাঁড়ায় সোমা। বাড়ির ঠিক দুপাশে দুটো বড় গোলাপের ঝাড়। হ্যাঁ, সেখানেও বেশ কিছু কলি দেখা দিচ্ছে। ডানদিকের গোলাপগুলো হলুদ আর লাল। বাঁ-দিকেরগুলো গোলাপি আর সাদা। এগুলো সব নিজের হাতে লাগানো সোমার। বাড়ির ঠিক সামনে রেড চেরির গাছে অসংখ্য গোলাপি কুঁড়ি। মেরির বাড়ির সামনে ডগউড গাছটিতে একটিও পাতা নেই। কিন্তু সাদা সাদা ঝাঁকড়া ডগউডে ছেয়ে গেছে দীর্ঘ

গাছটি। তার ঠিক পাশেই ক্র্যাব-অ্যাপল গাছটিতেও অনেক লালচে গোলাপি ফুল ফুটেছে। এই সময়টা বেশ লাগে। শীতের শেষে গাছে পাতা আসার আগেই ফুলে ফুলে ভরে যায় কাণ্ড – গাছের সমস্ত ডালাপালা।

প্রথম প্রথম এদেশে যখন এসেছিল সোমা, অবাক বিস্ময়ে গাছের এ ফুল ফোটা দেখত – দেখে পুলকিত হতো, শিহরিত হতো। পরিতৃপ্ত হতো চোখ। সোমা জানে না, আস্তে আস্তে কখন বাইরে থেকে চোখ সরিয়ে নিয়েছে। চোখ সরিয়ে কি নিয়েছে? আসলে ঘরের ভেতর চোখ দেওয়ার জিনিস আস্তে আস্তে বড্ড বেশি বেড়ে গেছে। দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে তা। রাস্তার ওপাশে রডরিগাসদের বাড়ির সামনে রোজ-অব-শ্যারনের লম্বা গাছটিতে প্রচুর গাঢ় গোলাপি রঙের ফুল ফুটে আছে। পাশে আরেকটি বাচ্চা রোজ-অব-শ্যারন গাছ। তাতেও বেশ কয়েকটি ফুল। সাদার ভেতর মধ্যিখানে খয়েরি রঙের ওই ফুল। এ-গাছটির নাম যখন জানতে পেরেছিল সোমা, খুব অদ্ভুত লেগেছিল তার। কীরকম রোমান্টিক নাম, রোজ-অব-শ্যারন। পাতাগুলো দেখে মনে হয়, ঠিক জবা গাছের মতো। ফুলগুলোও দেখতে লাল জবা অথবা ঝুমকো ফুলের মতো। মাঝখানে পরাগসহ একটা লম্বা ডাঁটি বেরিয়ে থাকে। ও-বাড়ির কর্ত্রী বারবারাকে জিজ্ঞেস করেছিল সোমা, সে জানে নাকি এ-গাছ হেবিসকাস গাছের ফ্যামিলি কিনা। বারবারা ঠিক বলতে পারেনি।

সামনের বাঁধানো বড় গোলাকার চত্বরটি, যার চারপাশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে দাঁড়িয়ে আছে মোট ছয়টি বাড়ি, তার ভেতর এখন পরমানন্দে বাইসাইকেল চালাচ্ছে কয়েকটি ছোট ছোট ছেলেমেয়ে। হঠাৎ সোমার মনে হলো, তাই তো, আজ যে গুড ফ্রাইডে। স্কুল ছুটি। অনেক স্কুল-কলেজ অবশ্য এ-পুরো সপ্তাহজুড়েই বন্ধ। বসন্তের ছুটি। অধিকাংশ অফিস অবশ্য খোলা আজ। সোমাদের বাড়ির ঠিক উলটোদিকের বাড়ির সামনে দাঁড় করানো বাস্কেটবলের উঁচু বাস্কেটটিতে একটি কালো আর আরেকটি সাদা কিশোর পালা করে বাস্কেটবল ছোড়ার মহড়া দিচ্ছে। সাদা ছেলেটিকে চিনতে পারে সোমা। সোমাদের বাঁ-পাশের বাড়ির ছেলে নিক। এরই মধ্যে আরো যেন লম্বা হয়ে গেছে ছেলেটি। এই নিকই তাদের ল্যাটিন আমেরিকান টিয়াটিকে কথা শেখাবার চেষ্টা করে সবসময়। ধৈর্য আছে বটে ছেলেটির। একই কথা কতবার করে বলে টিয়াটিকে।

সোমা আর দেরি করে না। লাঞ্চে যাওয়ার আগে নিজেকে একটু পরিপাটি করে নেবে আজ। কতদিন – কতদিন হয়ে গেল নিজের শরীর, মুখমণ্ডলের কোনো পরিচর্যা করে না সোমা। বাথরুমে গিয়ে আয়নায় নিজের মুখখানা আরেকবার দেখে। শার্লিকে দিয়ে চুলগুলো আবার আগের মতো কালো করে নেবে আজ। এই যে লালচে আভা তার চুলের ভেতর, এটা তার চুলের আসল রং নয়। কপালের ও জুলফির কাছে কয়েকটি রুপালি চুলের ঝিকিমিকি বাদ দিলে তার চুল মূলত: কালো। লালচে বাদামি অথবা মেহেদি রঙের মোটেও নয়। সোমা শুনেছিল, প্রথম যৌবনে অবিনাশের ফ্যান্টাসি ছিল, এক লালকেশি সাদা বিদেশিনীর সঙ্গে অন্তত: একটি রাত কাটাবার। অবিনাশকে চমকে দেওয়ার জন্যেই মেহেদি রঙের ছোঁয়া কেশে ধারণ করতে সাহস করেছিল সোমা। তাছাড়া, শার্লিও বলেছিল বাদামি গায়ের রঙ আর কালো চুলের সঙ্গে এই লালচে আভা খুব ভালো যায়। উজ্জ্বল করে তোলে বাদামি রঙের মেয়েদের।

অবিনাশ কখনো লক্ষ করেছে মনে হয় না, সোমার চুলের এই রঙ পরিবর্তন। এই রক্তিম আভা। সোমা ঠিক করে, আজ আবার তার নিজস্ব চুলের রং, অর্থাৎ কালোতে ফিরে যাবে। সেইসঙ্গে একটা ফেসিয়ালও নিয়ে নেবে। শার্লির সময় থাকলে হাতে-পায়ের নখগুলোর পরিচর্যাও করা যেতে পারে। আর্থরাইটিসের জন্যে হাঁটু বাঁকা করে পায়ের নখগুলো কাটতে আজকাল বড্ড বেশি কষ্ট হয় সোমার।

জামাকাপড় বদলে গাড়ি নিয়ে শার্লির দোকানের সামনে এসে যখন দাঁড়ালো সোমা, তখন বেলা সাড়ে নয়টার কাছাকাছি। চুল ছাড়াও শার্লি সোমার ভ্রু দুটো ঠিক করে দিল। ঠোঁট ও নাকের মাঝখানটিতে কয়েকটি অবাঞ্ছিত ছোট ছোট লোম, যা সোমাকে মাঝে মাঝে বিব্রত করত, তাও তুলে ফেলতে ভুলল না। চুলে রঙ মাখিয়ে, ফেসিয়াল ও হাতের-পায়ের নখের পরিচর্যা শেষ করল শার্লি। পা-দুখানাকে হালকা গরম জলে যখন ভিজিয়ে রাখল, কী অসম্ভব আরাম যে লাগল সোমার! মনে হলো, সে যেন এমন পরিচর্যা বহুকাল পায়নি। শার্লিজ বিউটি দোকানটি আসলেই অনন্য। একই জায়গায় সবকিছুর পরিচর্যা পাওয়া প্রায় অসম্ভব এদেশে। শার্লির এখানে না এলে চুলের জন্যে এক জায়গায়, মুখের জন্যে অন্য জায়গায়, নখের জন্যে তৃতীয় জায়গায় যেতে হতো সোমাকে। এবার শার্লির এখানে এসেছে সে প্রায় নয় মাস পর। সোমা ঠিক করে, এখন থেকে মাসে অন্তত একবার আসবে সে। আরাম করার, পরিচর্যা পাওয়ার তারও অধিকার আছে। শার্লি আজ সোমার ঘাড়টাও ম্যাসেজ করে দিল, যেহেতু হাতে সময় ছিল তার, আর এই সাতসকালে ভিড়ও ছিল না দোকানে। ভীষণ ভালো লাগছে সোমার এখন। শার্লির পাওনা টাকার সঙ্গে আজ বাড়তি দশটি ডলার দিলো সোমা টিপ্‌স হিসেবে।

বাইরে বেরিয়ে এসে দেখে, রোদটা বেশ কড়া হয়ে উঠেছে এরই মধ্যে। ক্যারলের সঙ্গে খেতে যেতে এখনো এক ঘণ্টার বেশি বাকি। গাড়ির সানভাইজরের গায়ে আটকানো আয়নায় নিজের মুখখানা দেখে নিজেরই ভালো লাগছে সোমার। গালে, কপালে, থুতনিতে হাত দিয়ে নিজের ত্বকের মসৃণতায় তৃপ্ত হয় সোমা। বড়দি সবসময় বলে, সোমা নাকি মায়ের

মতো সুঠাম ও কোমল ত্বক পেয়েছে। চুলে রঙ করায় আর খানিকটা আগা কেটে ফেলায় চুলগুলো আর আগের মতো পাতলা দেখাচ্ছে না।

হাতে পুরো একটি ঘণ্টা। আজকের দিনের প্রতিটি মুহূর্ত খুব মূল্যবান মনে হচ্ছে সোমার। এ-সময়টি ঘরে ফিরে গিয়ে আবার এখানে এসে শুধু শুধু অপচয় করে কী লাভ যেহেতু অলিভ গার্ডেন রেস্টুরেন্টটি এ-পাড়াতেই? সোমার হঠাৎ মনে পড়ে ডেভিড অনেকদিন বলেছে তার গ্যালারিটি একবার দেখে যেতে। তার নিজের এবং সংগৃহীত অন্য অনেকের বেশ কিছু নতুন পেইন্টিং এসেছে। ডেভিড সোমার প্রাক্তন সহকর্মী। যদিও ডেভিডের গ্যালারি খোলা থাকে বেলা দুটো থেকে রাত আটটা পর্যন্ত, যেহেতু গ্যালারির দোতলাতেই সে থাকে, এখন গেলেও সোমাকে গ্যালারি ঘুরিয়ে দেখাতে ডেভিডের অসুবিধা হবে না। একথা ডেভিডই বলেছে তাকে। সোমা ঠিক করে ফেলে, ডেভিডকে ফোন না করেই যাবে। হঠাৎ করে গিয়ে তাকে চমকে দেবে।

আজ থেকে ছয়-সাত বছর আগে একটা কাণ্ডই করেছিল ডেভিড। সে-কথা মনে করে পরে ওরা দুজনেই প্রচুর হেসেছে। কিন্তু সে-রাতে তখন সেটা ঠিক হাসির ব্যাপার ছিল না। সেই সময় প্রায় প্রতিদিন তেরো-চোদ্দো ঘণ্টা করে কাজ করতে হচ্ছিল সোমা, ডেভিড, ক্রিস্টির সেই ম্যাজেলান হেলথ প্রজেক্টে। একরাতে ডেভিডের কী হলো। কাজ করতে করতে হঠাৎ সোমাকে বলে বসল, তার একটা দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা হচ্ছে সেই মুহূর্তে। রয়েছে সোমার কাছে একটা বিশেষ অনুরোধ বা চাওয়া। হয়তো খুবই সামান্য –হয়তো বিশাল। কিন্তু এই মুহূর্তে তার জন্যে এটা জানানো বিশেষ জরুরি। সোমা সাহস দিলেই কেবল তা জানাবে ডেভিড। সোমা একটু চমকায়। কিন্তু নিজেকে সামলে নিয়ে জানতে চায় ডেভিড কী ভাবছে। ক্রিস্টি ততক্ষণে চলে গেছে বাড়ি। কেবল ডেভিড আর সোমা কাজ করছে তখন। ডেভিড খানিকক্ষণ দ্বিধার পর জানায়, সোমার খোলা চুলে একবার শুধু ডেভিড তার হাতখানা রাখতে চায়। ডেভিডের বয়স অন্তত দশ বছর কম সোমার চেয়ে। করপোরেট জগতে আর্থিক হিসাব-নিকাশের কাজ করলেও ডেভিড মূলত একজন শিল্পী। ছবি আঁকে সে। সোমা এক মুহূর্ত ভাবে। তারপর, 'অফ কোর্স' বলে হেসে ডেভিডের ডান হাতখানা তুলে নিজের মাথার ওপর চুলে রেখে বলে, 'কী? হলো, এবার?' ডেভিড শুধু একবার আলতোভাবে সোমার একগুচ্ছ চুল মুঠো করে ধরে ছেড়ে দিয়ে বলে, 'অনেক ধন্যবাদ'। সোমা বোঝে, ডেভিডের এ সাময়িক আচ্ছন্নতা থেকে মুক্তির জন্যে এই সামান্য ছোঁয়াটি বড় জরুরি ছিল। কিন্তু এরপর বেশ কিছুদিন সে খোলা চুলে অফিসে আসেনি আর। এর বছরখানেক পরেই অবশ্য ডেভিড হঠাৎ একদিন চাকরি ছেড়ে নিজের স্টুডিও ও ছবি আঁকা নিয়ে মেতে থাকা শুরু করে। ওর স্টুডিও সেট করার সময় সোমা যতটা সম্ভব সাহায্য করেছে। স্থানীয় কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়ার ব্যবস্থা করা থেকে শুরু করে, ওয়েবসাইট ডিজাইন করা, জায়গা নির্বাচন, সব ব্যাপারেই সঙ্গে ছিল সোমা। ডেভিডের এক সম্পদশালী কাকা হঠাৎ সে-সময়ে মারা যাওয়ায় ডেভিড আকস্মিকভাবেই একসঙ্গে অনেকগুলো টাকা পেয়েছিল, যা দিয়ে তার বহুদিনের শখের এ-গ্যালারি শুরু করতে পেরেছিল সে।

ঘরেই ছিল ডেভিড। দরজা খুলে সোমাকে দেখে তো অবাক! 'সোমা? তুমি?' পায়জামা আর গেঞ্জি পরা ডেভিড দরজায় দাঁড়িয়ে। 'এ-রাস্তা দিয়েই যাচ্ছিলাম। ভাবলাম, দেখে যাই তুমি কেমন আছ?'

'ভালো আছি। তোমার কী খবর? তোমার স্বামী?'

'ভালো। সব ভালো।' সোমা হাসে।

ডেভিড কিন্তু সোমাকে ঘরে যেতে আহ্বান করে না। ঘরের ভেতর মানুষের নড়াচড়ার ছায়া, টুংটাং বাসনের শব্দ। সোমা বোঝে অসময়ে এসে পড়েছে সে। ডেভিডের গ্যালারি দেখার উপযুক্ত সময় এটা নয়।

'আমার আজ হাতে একটুও সময় নেই। এক জায়গায় যাচ্ছি। আরেকদিন আসব তোমার স্টুডিও দেখতে। ইট ওয়াজ নাইস সিয়িং ইউ ডেভিড।' সোমা বেরিয়ে আসে ওখান থেকে। শূন্যস্থান পূর্ণ হতে সময় লাগে না, এটা কে না জানে? তবু ফোন না করে এভাবে হঠাৎ করে চলে আসায় নিজেকে কেমন বোকা বোকা লাগছে সোমার। অলিভ গার্ডেনে যেতে এখনো প্রায় চল্লিশ মিনিট বাকি। ড্রাইভ করতে করতে রাস্তার দুপাশের দোকানপাট দেখে সোমা। এ অঞ্চলে কেউ হাঁটে না রাস্তায়। কোনো ফুটপাতও নেই রাস্তার দুপাশে। বড় শহর থেকে এ শহরতলিতে এসে প্রথম প্রথম তাই কেমন অন্যরকম লাগতো সবকিছু। এখন অনেকটা অভ্যেস হয়ে গেছে। সোমা একটি কসমেটিক্সের দোকানে ঢোকে। মুখে ক্রিম আর ঠোঁটে কখনো কখনো লিপস্টিক ছাড়া অন্য কোনো প্রসাধন নেয় না সোমা। তবে তার একটা বড় দুর্বলতা আছে, সেটা সুগন্ধির প্রতি। অবিনাশও জানে সেকথা। তাই গিফট বলতে সে বরাবরই সোমার জন্যে পছন্দমতো পারফিউমই কিনে দেয়। কিন্তু ইদানীং অফিসের কাজ আর নিজের পোশাক-আশাক নিয়ে সে এতোই ব্যস্ত, সোমার জন্যে কোনো পারফিউম গত একবছরেও কেনার সময় হয়নি। অথচ নিজের জুতোর সঙ্গে প্যান্টের সঙ্গে মোজাটা পর্যন্ত ম্যাচ করে পরে আজকাল অফিসে যায় অবিনাশ। এতোটা সচেতন, এতোটা পরিপাটি পোশাকে-আশাকে আগে কখনো ছিল না সে। সোমা দেখেশুনে নিজের জন্যে তার প্রিয় পারফিউম অপিয়ামই কিনল একটা। তার আগে অবশ্য বেশ কয়েকটা স্যাম্পল দেখল, যদি নতুন কিছু বাজারে এসে থাকে, যা হঠাৎ করে ভালো লেগে যেতে পারে।

তেমন কিছু মনে ধরল না। অলিভ গার্ডেনে ঢুকতে গিয়ে লম্বা ড্রাইভওয়ের দুপাশে চোখ পড়ে হঠাৎ মনটা আনন্দে ভরে যায় সোমার।

ড্রাইভওয়ের দুপাশে সারি সারি যে ক্র্যাব-অ্যাপল আর ডগউডের গাছ, সেখান থেকে পিচঢালা বাঁধানো রাস্তায় পড়া সহস্র সহস্র ফুলের পাঁপড়ি ক্রমাগত গাড়ির চলাচলের ফলে মধ্য রাস্তা থেকে সব দুপাশে সরে এসে দুটি লম্বা গোলাপি লাইন তৈরি করেছে। পিচঢালা পথটি যেখানে ঘাসে মিশেছে সেই সীমানা বরাবর সেই লম্বা রেখা। মনে হচ্ছে, কোনো শিল্পী যেন সবুজ ঘাস আর কালো ড্রাইভওয়ের মাঝখানটিতে ব্রাশ দিয়ে কয়েক ইঞ্চি প্রশস্ত একটা গোলাপি রেখা এঁকে দিয়েছে। এতো মসৃণ, এতো নিটোল এই রেখা! কী অপূর্ব সুন্দর দেখাচ্ছে এই গোলাপি ফুলেল সরল রেখাটিকে।

ক্যারল আজ জন্মদিন বলে বেশ সেজেগুজে এসেছে। বেগুনি সাদা জংলি ছাপা সিল্কের একটি ড্রেস পরেছে ক্যারল। গলায় বেগুনি রঙের একটা স্কার্ফ। কানে, গলায়, হাতে মুক্তোর গয়না। বেশ দেখাচ্ছে আজ ক্যারলকে। বয়স যেন দশ বছর কমে গেছে তার। সোমার দেয়া রুপোর গয়নাগুলো দারুণ পছন্দ করল ক্যারল। সঙ্গে সঙ্গে মুক্তো খুলে রুপো পরল। খেতে খেতে হঠাৎ দূরের টেবিলে সিন্ডিকে দেখতে পেল সোমা। একসময় সিন্ডি সোমার প্রতিবেশী ছিল। কয়েক বছর আগে বাড়ি কিনে সাফার্ন চলে গেছে। যোগাযোগটা কমে গেছে ইদানীং। ক্যারলকে 'এক্সকিউজ মি' বলে সিন্ডির টেবিলে গিয়ে তাকে অবাক করে দেয় সোমা। সিন্ডি তার প্রতিবেশী লিন্ডাকে নিয়ে খেতে এসেছে। ডিভোর্সড সিন্ডি আর বিয়ে করেনি। সোমাকে তার নতুন সেলুলার ফোন নম্বর দেয় সিন্ডি। তার সেই বখাটে ছেলে ক্লিফ এখন অনেক শান্ত হয়ে এসেছে। এ-বছর হাইস্কুল শেষ করছে। শুনে খুব খুশি হয় সোমা। সিন্ডির সঙ্গে যোগাযোগ পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি দিয়ে নিজের টেবিলে ফিরে আসে সে।

অলিভ গার্ডেন থেকে যখন বেরিয়ে আসে সোমা, তখন বেলা একটা বেজে গেছে। এখনো হাতে অর্ধেক দিন সময়। একটু একটু করে আকাশে মেঘ জমছে। সন্ধ্যায় নাকি খানিকটা বৃষ্টি হতে পারে। এখনো চারদিক দেখে বৃষ্টির কোনো আভাস পাওয়া যায় না, ওই উড়ো উড়ো বিচ্ছিন্ন কিছু সাদা মেঘ ছাড়া। সোমা ন্যানুয়েট মলে গাড়ি পার্ক করে, ১১/এ বাসের জন্যে অপেক্ষা করে। সময় যখন আছে, নিউইয়র্ক শহরে স্লোন ক্যাটারিং হাসপাতালে গিয়ে আজ দেখে আসবে সেলিমাকে। সোমা শুনেছে সেলিমা ভালো নেই। বাঁচবে না। আজকাল বেশ ঘনঘনই যেতে হচ্ছে তাকে হাসপাতালে। ১১/এ বাসের জন্যে দশ মিনিটও অপেক্ষা করতে হলো না, যদিও টাইমটেবল জানা ছিল না তার। ড্রাইভার সিটে হ্যারিকে দেখে খুশি হয় সোমা। হ্যারি নিজেও বহুদিন পর সোমাকে দেখে উৎফুল্ল হয়। জানতে চায়, শহরে যাওয়া আজকাল একেবারে ছেড়েই দিয়েছে কিনা সোমা। ডাইনের একেবারে সামনের সিটটিতে বসে সোমা। যাত্রীদের কাছ থেকে ভাড়া নিতে নিতে ও টিকিট দিতে দিতে সোমার সঙ্গে টুকটাক কথা বলে হ্যারি। সোমা জানায়, হ্যারির ওজন বেশ খানিকটা কমেছে। শুনে খুশি হয় হ্যারি। বলে, 'চেষ্টা করছি, আরো খানিকটা কমাতে হবে। ডাক্তারের নির্দেশ।'

বাস চলছে হাইওয়ে ধরে। পাশে সমান্তরালভাবে চলে যাওয়া হাঁটা পথে বেশ কয়েকটা নারীপুরুষ এই দুপুরের রোদেও সাইকেল চালাচ্ছে। কয়েকজন জগিংও করছে। সোমা বোঝে, আজকাল মানুষ আগের চেয়ে অনেক বেশি স্বাস্থ্যসচেতন হয়েছে, খাওয়া-দাওয়ায়, চলাফেরায়, জীবনযাত্রায়। এটা ভালো লক্ষণ। জীবনধারণের এরকম গুণগত পরিবর্তনই তো এক প্রজন্মকে আগের প্রজন্ম থেকে এগিয়ে নিয়ে যায়। পোর্ট অথরিটি বাস টার্মিনাল থেকে সাবওয়েতে করে স্লোন ক্যাটারিংয়ে যখন পৌঁছল সোমা, তখন দুটো চল্লিশ বাজে। ভিজিটিং আওয়ার এটা নয়। কিন্তু সেলিমার জন্যে বিশেষ ব্যবস্থা করা আছে একথা সেলিমা নিজেই বলেছে সোমাকে। অসময়ে আসায় অসুবিধা হবে না। দূর থেকে আসায় এ বিশেষ খাতির। সেলিমাকে দেখে মনে হয় না ক্যান্সার-রোগী। মাথার চুল পড়ে যাওয়ায় পরচুলা পরে থাকে সেলিমা। না-জানলে সেটাও বোঝার উপায় নেই। এছাড়া শরীরে জরার কোনো লক্ষণ নেই। বিছানায় বসে বসে টিভি দেখছিল সেলিমা। খুব খুশি হয় সোমাকে দেখে। জানায়, আগের চেয়ে অনেক ভালো বোধ করছে সে। যদিও ডাক্তার বলে দিয়েছে, তার রোগমুক্তির কোনো সম্ভাবনা নেই। তবে যতটা সম্ভব সেলিমাকে ভালো রাখার চেষ্টা করবে ডাক্তাররা। সোমা থাকতে থাকতেই সেলিমার স্বামী – আরশাদ এসে ঢোকে ঘরে। সেলিমার চাইতে বরং তাকেই বেশি অসুস্থ ও মনমরা মনে হয় সোমার। সোমা এসেছে দেখে খুব খুশি হয় আরশাদ। জানায়, সেলিমা প্রতিদিনই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সবার কথা জিজ্ঞেস করে। সোমার হঠাৎ খুব অপরাধবোধ হয়। এ-কাজটি আরো আগে করা উচিত ছিল। সেলিমাকে মাঝে মাঝে এসে দেখে যাওয়া বড়ই দরকার ছিল, যা সে করেনি বা করতে পারেনি নানা ঝামেলায়। শিগগিরই আবার আসবে কথা দিয়ে বেরিয়ে আসে সোমা। স্লোন ক্যাটারিংয়ের সামনে পাবলিক স্কুলের যে-চৌকো বাঁধানো খেলার জায়গাটি ছিল, সেখানে এখন পার্ক। কয়েকটি মা স্ট্রলারে করে বাচ্চা নিয়ে এসে বসে আছে সেখানে। একটি মা, তিন-চার বছরের এক অস্থির মেয়েকে কী বলে বলে শান্ত করার চেষ্টা করছে। মেয়েটি হাত-পা নাচিয়ে, চ্যাঁচামেচি করে কীসের জন্যে যেন ভীষণ বায়না করছে। কী আশ্চর্য ধৈর্য মায়ের। এরপরও আস্তে আস্তে অনবরত কী যেন বলে যাচ্ছে কন্যাকে শান্ত করার জন্যে। সোমা মনে করার চেষ্টা করে এই

অপরিসীম ধৈর্য তার নিজের ছিল কিনা, তার সন্তানরা যখন ছোট ছিল। ফেরার পথে লেক্সিংটন সাবওয়ে স্টেশনের মাঝখানের খোলা জায়গাটিতে একটা ছোট্ট জটলা দেখতে পায় সোমা। সেই পরিচিত অন্ধ লোকটি গিটার বাজিয়ে গান করছে। আর লোকেরা গোল করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তা শুনছে। কেউ কেউ খুচরো পয়সা, এক-দু ডলার দিচ্ছে সামনে বিছানো চাদরটির ওপর। সোমাও দাঁড়িয়ে পড়ে। খানিকক্ষণ একমনে শোনে অন্ধ শিল্পীটির মুখে হ্যারি নিলসনের সেই বিখ্যাত গান, আই ক্যান্ট লিভ উইদাউট ইউ। একটি ডলার দিয়ে সোমা সেখান থেকে চলে আসে সাবওয়ের কাছে। এই লোকটি আগে একসময় সিক্সটিএইট স্ট্রিট সাবওয়ে স্টেশনের মুখে বসে গান করত। শহরে যখন ছিল, কতবার দেখেছে সোমা। স্থান পরিবর্তন করে ভালোই করেছে সে। এখানে অনেক বেশি ট্রেন আসে। লোক-সমাগমও বেশি।

সাবওয়েতে এখন ভিড় হতে শুরু করেছে। একটু পরই রাশ আওয়ারে তিল ধারণের জায়গা থাকবে না। ঊর্ধ্বশ্বাসে সকলে ঘরে ফেরার নেশায় ব্যস্ত হয়ে উঠবে। সোমা দাঁড়িয়ে আছে ওপরের সমান্তরাল রডটি ডান হাত দিয়ে চেপে ধরে। একটি চাইনিজ চেহারার লোক তার ব্রিফকেসটি একবার মেঝেতে দুপায়ের মাঝখানে, একবার ডানহাতে ওপরে উঁচু করে ধরে নিজে কোনোমতে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকার চেষ্টা করছে। পাশে ঘন বাদামি চুলের এক অল্পবয়সী যুবক এতো ভিড়ের ভেতরও ভাঁজ করে একটি পেপারব্যাকের বই খুব মনোযোগ দিয়ে পড়ে যাচ্ছে। নিশ্চয়ই কোনো রোমান্টিক অথবা রহস্যোপন্যাস। ডানদিকের সিটে বসা কালো এক মহিলার কোলে বসে বছর দু-তিনেকের একটি ছেলে ছোট্ট পটেটো চিপসের এক প্যাকেট থেকে একটি একটি করে চিপস বের করে মুখে পুরছে। সোমা অবাক হয়ে লক্ষ্য করে, এতো সাবধানি বাচ্চাটি যে এক টুকরো চিপসও মুখের বাইরে পড়ছে না।

পোর্ট অথরিটি স্টেশনে এসে এবার আর ১১/এ নয়, ৪৭ নম্বর এক্সপ্রেস বাসে উঠে পড়ল সোমা। ন্যানুয়েট মলে নেমে দেখে পার্কিংলটে এখন দুপুরের তুলনায় অনেক বেশি গাড়ি। মোটামুটি মনে থাকলেও, ঠিক কোথায় গাড়িটা পার্ক করেছিল আজ দেখে রাখেনি সোমা। অনুমানের ওপর ভিত্তি করে এক জায়গায় এসে গাড়ির চাবির কি-প্যাডে চাপ দেয়। খানিকটা দূরে একটা গাড়ির হেডলাইট দুটো একবার জ্বলে নিভে যায়, সেইসঙ্গে অল্প হর্ন। সোমা দ্রুত তার গাড়িতে গিয়ে স্টার্ট দেয়। প্রযুক্তি কত সুবিধেই না করেছে। এভাবে চিহ্নিত করার সুযোগ না থাকলে কতক্ষণ না জানি গাড়ি খুঁজে বেড়াতে হতো আজ। প্যালিসেডস পার্কওয়ে ধরে উত্তরে যাওয়ার কথা সোমার। সেদিকেই তার বাড়ি। কিন্তু আজ অন্যদিনের মতো নয়। তাই আজ উত্তরে না গিয়ে প্যালিসেডসের দক্ষিণের দিকে যেতে শুরু করল সোমা। ওদিকে হাডসনের ধার ঘেঁষে যে দুটো সুন্দর লুকআউট আছে, সেখানে গাড়ি থামিয়ে খানিকটা সময় কাটানো যাবে আজ। প্রথম লুকআউটটাতেই থামে সোমা। গাড়ি বন্ধ করে বাইরে বেরিয়ে আসে। হালকা হাওয়ায় কীরকম শিরশির একটা শব্দ হচ্ছে। ঘন গাছে অল্প অল্প পাতা দেখা দিয়েছে। হালকা হলদে সবুজ রঙের সব পাতা। হাওয়ায় তিরতির করে কাঁপছে ওগুলো। সোমা হাঁটতে হাঁটতে নদীর ধারে এসে দাঁড়ায়। এ-জায়গাটি নদী থেকে অনেক উঁচুতে। বড় বড় পাথর বসানো ধারটিতে। তারপরে আছে স্টিলের বেড়া। সোমা একটা বড় পাথরের ওপরে দাঁড়িয়ে নদীর ওপারে ওয়েস্টচেস্টার কাউন্টির বাড়িঘর, গাছপালা দেখে। হাডসনের ওপর দিয়ে কয়েকটা স্পিডবোট চলে গেল। একটা মালবাহী জাহাজ আস্তে আস্তে এগুচ্ছে। একজন সার্ফিংও করছে এরই মধ্যে। সোমার হঠাৎ মনে পড়ে ছোটবেলার কথা। লৌহজংয়ের কথা। নদীর ধারে বিকেলবেলা বাবার হাত ধরে মাঝে মাঝে বেড়াতে যেত সোমা। বিশেষ করে গোয়ালন্দগামী বিশাল বিশাল স্টিমারগুলো দেখতে বড় ভালো লাগতো তার। কতরকম লোকজন দেখা যেত সেখানে গেলে। কেউ আসছে, কেউ যাচ্ছে। কারো ভীষণ তাড়া, কেউ-বা আস্তে-ধীরে নামছে, বা উঠছে স্টিমারে। কারো মাথায়, ঘাড়ে বোঁচকা, পোঁটলা, কারো হাতে ব্যাগ, স্যুটকেস। সে এক অভিনব দৃশ্য। সোমা লক্ষ্য করে, সে ছাড়াও এ লুকআউটে আরো এক জোড়া তরুণ-তরুণী আপনমনে ঘুরে বেড়াচ্ছে ডান পাশটাতে। ওদের লাল রঙের হোন্ডা একর্ডটি পার্ক করা সোমার ঠিক পেছনেই। নদীর ধারঘেঁষে লম্বা স্ট্যান্ডের ওপর বাইনক্যুলারগুলো সাড়ি সাড়ি দাঁড় করানো। আস্তে আস্তে একটি বাইনক্যুলারের পেছনে গিয়ে দাঁড়ালো সোমা। ব্যাগ থেকে একটা কোয়ার্টার বের করে বাইনক্যুলারের নির্ধারিত ছিদ্রের ভেতর দিতেই একটা যান্ত্রিক আওয়াজ বেরুল। সঙ্গে সঙ্গে হাত দিয়ে ধরতেই বাইনক্যুলারের মাথাটা ডান থেকে বাঁ-দিকে অনায়াসে ঘুরতে শুরু করল। কখনো কোনো জায়গায় স্থির রেখে, কখনো বাইনক্যুলারটি ক্রমান্বয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সোমা নদীর ওপারের গাছপালা, বসতি দেখতে থাকে। শিশুর মতো উত্তেজনা বোধ করে সে নিজের মধ্যে। একটি আট-দশ বগির ছোট্ট ট্রেন নদীর ধার দিয়ে উত্তরে চলে যাচ্ছে। নিশ্চয়ই ম্যানহাটান থেকে দৈনিক কম্যুটার যাত্রীদের ঘরে পৌঁছে দিচ্ছে এ-ট্রেন, ওয়েস্টচেস্টারের বিভিন্ন ছোট ছোট শহর বা গ্রামে। হঠাৎ এক ফোঁটা জল এসে পড়ল সোমার মাথায়। হাত দিয়ে তা পরীক্ষা করতে না করতেই আরো কয়েক ফোঁটা জল এসে পড়ল হাতে, পায়ে, মুখে। দেখতে দেখতে একটু একটু করে ঝিরঝির করে বৃষ্টি শুরু হলো। ওপাশের ছেলেমেয়ে দুটো দ্রুত দৌড়ে তাদের গাড়িতে গিয়ে উঠল। কিন্তু গাড়ি স্টার্ট দিলো না ওরা। ভেতরেই বসে রইল। সোমা যেখানে দাঁড়িয়েছিল সেখানেই দাঁড়িয়ে রইল চুপচাপ। হাডসনের দিকে মুখ করে। আস্তে আস্তে অন্ধকার নেমে এলো।

একটি একটি করে নদীর ওপারে ওয়েস্টচেস্টারের আলোগুলো জ্বলে উঠল। ল্যাম্পপোস্ট থেকে ধোঁয়া ধোঁয়া আলো বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে সোমার গায়ে চুঁইয়ে পড়তে থাকল।

নদীর উলটোদিকে আবার তাকায় সোমা। ওদিকের জায়গাটা পাহাড়ি। ফলে মনে হচ্ছে, আলোর কণাগুলো সিঁড়ি বেয়ে আস্তে আস্তে উঠে গেছে আকাশে। অল্প অন্ধকারে। সোমা দাঁড়িয়েই থাকে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে হাডসন দেখে, আলো দেখে। বৃষ্টির ছিটা ছিটা জল আস্তে আস্তে তার সর্বাঙ্গ নাইয়ে দিতে থাকে। সোমা নড়ে না। এ-দৃশ্য দেখে এই মুহূর্তে যা তাকে সবচেয়ে আচ্ছন্ন করে রাখার কথা ছিল, সেই ছ'সাত বছর আগের এক গ্রীষ্মে সুইজারল্যান্ডের লেক লুসার্নের পাশে দাঁড়িয়ে দেখা পাহাড় আর জলাশয়ের অপূর্ব সৌন্দর্য কিন্তু একবার মাত্র মনে উঁকি দিয়েই সঙ্গে সঙ্গে মিলিয়ে যায়। সোমার কেবল মনে পড়তে থাকে, অনেক রাতে লঞ্চে অথবা বড় নৌকায় করে বাড়ি ফেরার পথে ধলেশ্বরীর জলের সেই অনবরত ছলাৎ ছলাৎ অথবা ছপছপ শব্দের কথা। সেই সঙ্গে চোখে ভাসতে থাকে বিস্তীর্ণ নদীতে ভাসমান অসংখ্য জেলে নৌকা আর পারের বাড়িঘর থেকে ছিটকে বেরিয়ে আসা ছোট ছোট আলোর কণাগুলো যা ক্রমাগত ঘুরে বেড়ায় অথবা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে নিকষ কালো অন্ধকারে।